গল্প

বোঝা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

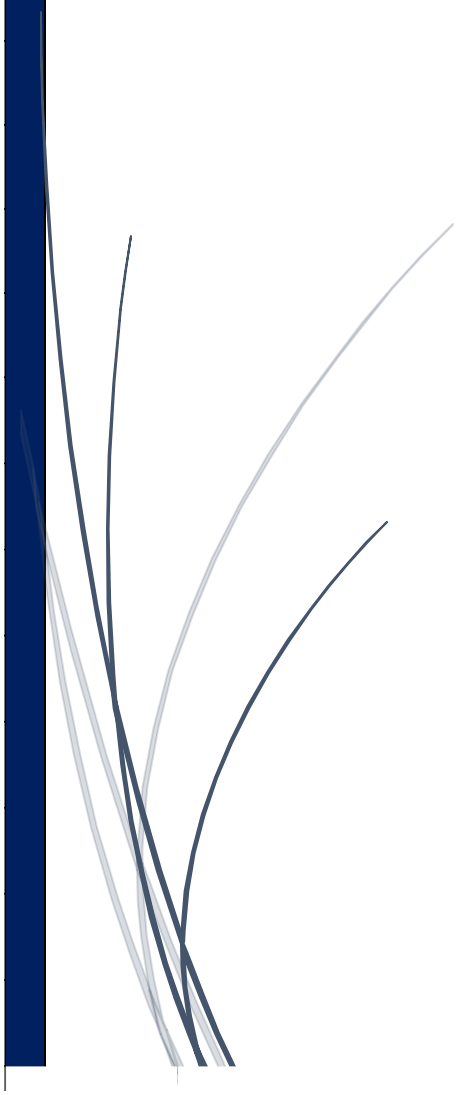

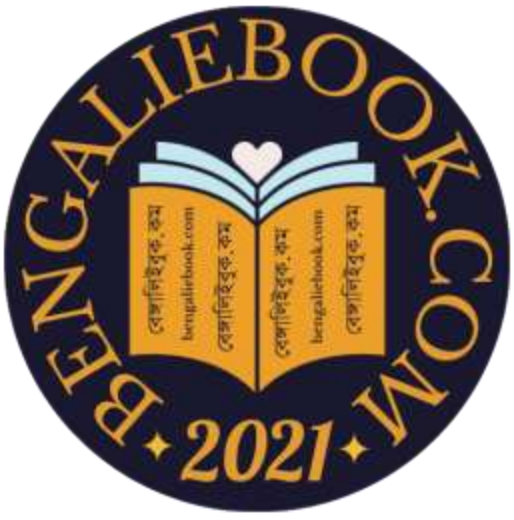

বোঝা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ সাগরপুরে আজ মহাধুম, রোশনচৌকি আর ঢাকের বাদ্যে গ্রাম সরগরম। সপ্তাহ ধরিয়া যে কি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্তী চারি-পাঁচ ক্রোশের সকল লোক জানে। এ রাজসূয়-যজ্ঞে ঢাকঢোলের এমন মহান একত্র সমাবেশ, সানাই-দলের এমন আদর্শ ঐক্যভাব, কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের এমন প্রচণ্ড বিক্রম দেখা গিয়াছিল যে, গ্রামের লোক ইতিপূর্বে এমন কাণ্ড কখনও আর দেখে নাই। রংবেরং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যশ্রেনীর যে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামের পশুগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ গরু-বাছুরের দল, ঢাকঢোলের আত্মদ্রোহিতায় তাহাদের মর্মপীড়ার আর সীমা নাই। এত সমারোহের কারণ, একটা নাবালক চতুর্দশবর্ষীয় বালকের বিবাহ। সাগরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরদেব মিত্রের একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই এমন কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। হরদেব মিত্র বেশ বড়লোক, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা তাহার বাৎসরিক আয়। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, হেয়ার সাহেবের স্কুলে এন্ট্রাস ক্লাশে সে পড়ে। অত অল্পবয়সে বিবাহের কারণ, একমাত্র সত্যেন্দ্রর মাতার বধূমুখ দেখিবার একান্ত সাধ।

বর্ধমান জেলার দিলজানপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত সত্যেন্দ্রর বিবাহ হইয়া গেল।

রাঙ্গা বৌ। সত্যেন্দ্র মহাসুখী।

দশ বছরের টুকটুকে ছোট বৌটির মুখ দেখিয়া সত্যেন্দ্রর জননী বিশেষ হৃষ্টচিত্ত হইলেন। বিবাহের পরবৎসরেই হরদেববাবু বধূ আনিলেন কারণ গৃহিণীর এরূপ অভিসন্ধি

ছিল না যে, বধূকে পিতৃগৃহে রাখিয়া দেন। তিনি প্রায় বলিতেন, বিবাহ হইলে মেয়েকে আর বাপের বাটীতে রাখিতে নাই। মতটা মন্দ নহে।

সত্যেন্দ্রর পাঠের সুবিধার জন্য হরদেববাবুকে সস্ত্রীক কলিকাতাতেই থাকিতে হইত, সরলা কলিকাতায় আসিল। অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সরলা হরদেববাবুর সহিত কথা কহিত, এমন কি সত্যেন্দ্র উপস্থিত থাকিলেও সে শ্বশ্রূঠাকুরানীর সহিত কথা বলিত, গৃহিণীর তাহাতে সুখ ভিন্ন অসুখ ছিল না।

কিছুদিন পরে কামাখ্যাবাবু সরলাকে একবার বাটী লইয়া গেলেন, তাহার দুই-এক মাস পরে সত্যেন্দ্র একদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, বইগুলোতে ছাতা ধরেচে, দোয়াতের কালি শুকিয়ে গেছে, এমন একজন নেই যে এগুলো দেখে!

কথাটা মা বুঝিলেন, হরদেববাবুরও কানে গেল; তিনি হাসিয়া বৌ আনিতে পাঠাইলেন; লিখিলেন, আমার বাটীতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, মা ভিন্ন বোধ হয় থামিবে না। সুতরাং মাকে পাঠাইয়া দিবেন।

আবার সরলা আসিল। সত্যর ছোটখাট কাজগুলি সে-ই করিত। বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখা, কলেজের কাপড়জামাগুলি ঠিক করিয়া রাখা, অর্থাৎ তাড়াতাড়িতে দুই হাতে দুইরকমের বোতাম, কিংবা আহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কলেজের এক ঘণ্টা যায় যায় সময়ে, এক পায় কার্পেটের অপর পায় বার্নিস-করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে, ফরসা জামার উপর রজক-ভবনে শুভাগমনের জন্য প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয় এইসব কাজগুলা সরলাই দেখিত; সরলা না থাকিলে এ-সব গণ্ডগোল তাহার প্রায়ই ঘটিত। এমন অন্যমনস্ক লোক কেহ কখনও দেখে নাই। এ-সকল কাজ সরলা ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা হইতও না বটে, আর হইলেও সত্যেন্দ্রর পছন্দ হইত না বলিয়াও বটে, কাজগুলি সরলাই করিত।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুশীলার ছেলের অন্নপ্রাশন

সুশীলা সরলার বড়দিদি। তাহার ছেলের ভাত। সুতরাং কামাখ্যাবাবু দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে সরলাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

সরলার দিদি, সরলা ও সত্যেন্দ্রকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। বিশেষ, সরলা প্রায় তিন বৎসর যাবৎ দিলজানপুরে যায় নাই। সত্যেন্দ্রও যখন যাইতে সম্মত হইল, তখন কামাখ্যাবাবু পরমানন্দে জামাতা-কন্যা লইয়া দেশে আসিলেন।

গৃহিণী বহুদিবসের পর তাহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। যাহার ছেলের ভাত, সে আসিয়া দুইজনকেই অনেক কথা শুনাইয়া দিল, অনেক রকমে আপ্যায়িত করিল।

শুভকর্ম নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া যাইবার পর সত্যেন্দ্র বাটী যাইতে চাহিল, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন, বলিলেন, এতদিন পরে এসেচ, আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

সরলাও ছাড়িল না, সুতরাং আরও দুই-চারিদিন থাকিতে সত্যেন্দ্র সম্মত হইল। দুই-চারিদিন কাটিয়া গেল, তবু সরলা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু না যাইলেও নহে, পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হয়; পরীক্ষারও অধিক বিলম্ব নাই। আসিবার সময় সরলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে আবার কবে নিয়ে যাবে?

সত্যেন্দ্র কহিল, যখন যাবে তখনই।

তা হলে আমাকে দশ-বারদিন পরেই নিয়ে যেও।

সত্যেন্দ্র অতিশয় আহ্লাদিত হইল। সে এতটা ভাবে নাই।

তখন অশ্রুজলের মধ্যে সরলা স্বামীকে বিদায় দিয়া হাসিয়া বলিল, দেখো, আমার জন্য যেন ভেবো না, আর রাত্রি পর্যন্ত পড়ে যেন অসুখ না হয়।

রাত্রি দশটার অধিক না পড়িবার জন্য সরলা বিশেষ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া দিল। কি একটা উদাস-পারা প্রাণ লইয়া সত্যেন্দ্র সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক লইয়া বসিয়াছিল। পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মনের একটা বিষম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র গণিয়া দেখিল, সমস্ত দিনে মোটে ছাব্বিশ লাইন পড়া হইয়াছে। দুঃখিতভাবে সে ভাবিল, বাঃ! এইরকম পড়লেই পাস হবো। ক্রমে দুঃখ ঈষৎ ক্রোধে পরিণত হইল। সে ভাবিল, সমস্ত পোড়ামুখী সরোর দোষ। এই পাঁচদিন এসেচি, একটুকুও পড়তে পারিনি। আগে মনে হ'তো পড়ার সময় বিরক্ত করে, দশটার বেশি পড়তে গেলেই আলো নিভিয়ে দেয়, একে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল করে পড়বো। ঠিক উলটো! কালই তাকে আনতে যাবো, না হলে লজ্জার খাতিরে কি ফেল্ হবো?

এ কি? বটে সরলা? বেশ বুঝিয়াছ। অন্তর্দাহে তাহারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাউক, একফোঁটা জল যেন না পড়ে। অশ্রু স্ত্রীলোকের জন্য। পুরুষের তাহাতে হাত দিবার অধিকার নাই। যন্ত্রণায় পুড়িয়া যাও, কাঁদিতে পাইবে না। কাঁদিলে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। সরলা! এ ব্যবস্থা কি তোমরাই করিয়াছ? সরলা স্বামীর হাত আপনার হাতে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, পরজন্ম বিশ্বাস কর কি?

সত্যেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, করতাম কি না জানি না, কিন্তু আজ হতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব।

সরলার মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া কামাখ্যাবাবু, হরদেববাবু এবং ডাক্তারবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, আশা বড় কম, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরদিন বেলা সাতটার সময় সরলার মৃত্যু হইল।

সন্ধ্যার সময় হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার বিবাহ

কি যেন কি একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্বের সুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অর্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার আজীবন সহচর সেই অর্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাঁদিব, না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উলটাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে। কিছুই যেন আর ঠাহর হয় না। এ কি হইল? নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানালায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছগুলা কি একটা নিস্তব্ধ ভাব সত্যেন্দ্রর সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈ কি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সেই এক কথা বলিয়া বেড়ায়! হইয়াছে কি? পাপিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে মরে গেল। বৌ-কথা-কও পাখিও আর আপনার বোল বলে না। সেও বলে, বৌ মরে গেছে। সব জিনিস ঐ একই কথা বার বার কহিয়া বেড়ায় কেন? সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস যেন ঐ কথাই কহে—নেই, নেই, সে নেই!

কেমন আছ সত্য? মাথাটা কি বড় ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়? সে ত আজ অনেকদিন হইল! একটু শোও না ভাই! চিরকাল কি একইভাবে ঐ জানালায় বসিয়া থাকিবে? সত্যেন্দ্র অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিতেছিল। যেটি সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ, সেটিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল।

চক্ষু মুদিতে সাহস হয় না—পাছে সেটি হারাইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার সেটিকে দেখিবার চেষ্টা করে। আলো ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নায় আর আমোদ হয় না। অত ক্ষীণালোকবিশিষ্ট নক্ষত্র কি আলোকে দেখা যায়! সত্যেন্দ্র এম. এ. পরীক্ষায় ফেল হইয়া গিয়াছে। পাস হইবার ইচ্ছাও আর নাই। উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে, পাস করিলে কি নক্ষত্র কাছে আসে? হরদেববাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বলে, সে বাটী হইতেই ভাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। শহরের অত গণ্ডগোলে ভাল পড়াশুনা হয় না। সত্যেন্দ্র এখন

একরকমের লোক হইয়া গিয়াছে, মুখখানা দেখিলে বোধ হয়, যেন বহুদিন কিছু খাইতে পায় নাই, যেন মস্ত পীড়া হইতে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করিয়াছে!

দুপুরবেলা সত্য ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ফটোগ্রাফ ঝাড়িয়া ধূলা পরিষ্কার করে; নিজের পুরাতন পুস্তকগুলি সাজাইতে বসে; হারমোনিয়ামের ঝাঁপ খুলিয়া মিছামিছি পরিষ্কার করে। সরলার পরিষ্কৃত পুস্তকগুলি আরও পরিষ্কার করে; ভাল ভাল কাগজ খাম লইয়া সরলাকে পত্র লিখিয়া কি একটা শিরোনামা দিয়া নিজের বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকের কপাল তোমারই মত অল্পবয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান, সত্য! সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও, কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রর জননী বড় বুদ্ধিমতী। তিনি একদিন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, সত্য আমার কি হয়ে গেছে দেখচ?

কর্তা বলিলেন, দেখচি ত—কিন্তু কি করি?

আবার বিবাহ দাও। ভাল বৌ হলে সত্য আবার হাসবে—আবার কথা কবে।

সেদিন সত্য আহার করিতে বসিলে জননী বলিলেন, আমার একটা কথা শুনবে?

কি?

তোমাকে আবার বিবাহ করতে হবে।

সত্য হাসিয়া কহিল, এই কথা! তা বুড়ো বয়সে, আবার ও-সব কেন?

মা পূর্ব হইতেই অশ্রু সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন বিনা বাক্যব্যয়ে নামিতে আরম্ভ করিল। মা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাবা, এই একুশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না, কিন্তু সরলার কথা মনে হলে এ-সব আর মুখে আনতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি আর একা থাকতে পারি না।

পরদিন প্রাতে হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া ঐ কথাই বলিলেন। সত্যেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। হরদেববাবু বুঝিলেন, মৌন ভাব সম্মতির লক্ষণমাত্র।

সত্যেন্দ্র ঘরে আসিয়া সরলার ফটোর সন্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, শুনচো সরো, আমার বিয়ে হবে! ফটোগ্রাফ কথা কহিতে পারে না। পারিলে কি বলিত? 'বেশ ত', বলিত কি?

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নলিনী

সত্যেন্দ্রর এবার কলিকাতায় বিবাহ হইল। শুভদৃষ্টির সময় সত্যেন্দ্র দেখিল মুখখানি বড় সুন্দর। হউক সুন্দর, সে তথাপি ভাবিল, তাহার মাথায় একটা বোঝা চাপিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর নলিনী পিতৃগৃহে রহিল। তৃতীয় বৎসরে সে শ্বশুরভবনে আসিয়াছে, গৃহিণী নূতন বধূর চাঁদপানা মুখ দেখিয়া আবার সরলাকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন, আবার সংসার পাতিবার চেষ্টা করিলেন।

রাত্রে যখন দুইজনে পাশাপাশি শুইয়া থাকে, তখন কেহই কাহারও সহিত কথা কহে

না। নলিনী ভাবে, কেন এত অযত্ন? সত্য ভাবে, এ কোথাকার কে যে আমার সরোর জায়গায় শুইয়া থাকে?

নূতন বধূ লজ্জায় স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারে না—সত্যেন্দ্র ভাবে, কথা কহে না ভালই।

একদিন রাত্রে সত্যেন্দ্রর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে সে দেখিল, শয্যায় কেহ নাই। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কে একজন জানালায় বসিয়া আছে। জানালা খোলা। খোলা পথে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছে, সেই আলোকে সত্যেন্দ্র নলিনীর মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইল, ঘুমের ঘোরে জ্যোৎস্নার আলোকে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইল।

কান পাতিয়া সে শুনিল, নলিনী কাঁদিতেছে।

সত্য ডাকিল, নলিনী—

নলিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামী আহ্বান করিয়াছেন! অন্য মেয়ে কি করিত জানি না, কিন্তু নলিনী ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে বসিল।

সত্যেন্দ্র বলিল, কাঁদচ কেন?কাঁদচ কেন?

অশ্রুবেগ দ্বিগুণ মাত্রায় বহিতে লাগিল, তাহার ষোল বৎসর বয়সে স্বামীর এই আদরের কথা!

অনেকক্ষণ চাপিয়া চাপিয়া কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার না কেন?

কি জানি কেন! সত্যরও বড় কান্না আসিতেছিল। তাহা রোধ করিয়া সে বলিল, দেখতে পারি না তোমাকে কে বললে? তবে যত্ন করতে পারি না।

নলিনী নিরুত্তরে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, ভেবেছিলাম এ কথা কাকেও বলব না, কিন্তু না বলেও কোন লাভ নাই, তোমাকে কিছু গোপন করব না। সকল কথা খুলে বললে বুঝতে, আমি এমন কেন। আমি এখনও সরলাকে—আমার পূর্ব-স্ত্রীকে ভুলতে পারিনি। ভুলব, এমন ভরসাও করি না, ইচ্ছাও করি না। তুমি হতভাগ্যের হাতে পড়েচ—তোমাকে কখনও সুখী করতে পারব, এ আশা মনে হয় না। নিজের ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করিনি—নিজের ইচ্ছায় তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

গভীর নিশীথে দুইজনে অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র বুঝিতে পারিল, নলিনী কাঁদিতেছে। সে কাঁদিয়াছিল কি? একে একে সরলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই মুখখানি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—সেই 'নিতে এসেচ?' মনে পড়িল। অনাহূত অশ্রু সত্যেন্দ্রর নয়ন রোধ করিল, তাহার পর গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িল।

চক্ষু মুছিয়া সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে নলিনীর হাত দুটি আপনার হাতে লইয়া বলিল, কেঁদো না নলিনী, আমার হাত কি? নিশিদিন অন্তরে আমি কি যন্ত্রণাই যে ভোগ করি তা কেউ জানে না। মনে বড় কষ্ট। এ কষ্ট যদি কখনও যায়, তাহলে হয়ত তোমাকে ভালবাসতে পারবো, হয়ত তোমাকে আবার যত্ন করতে পারবো।

এই বিষাদপূর্ণ স্নেহমাখা কথার মূল্য কয়জন বুঝে? নলিনী বড় বুদ্ধিমতী; সে স্বামীর কষ্ট বুঝিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসে না, এ কথা সে তাঁহার মুখে শুনিল, তথাপি তাহার অভিমান হইল না। বোকা মেয়ে। ষোল বৎসরে যদি অভিমান করিবে না তবে করিবে কবে? কিন্তু নলিনী ভাবিল, অভিমান আগে, না স্বামী আগে?

সেইদিন হইতে কি করিলে স্বামীর কষ্ট যায়, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে স্বামী সতীনকে ভুলিতে পারেন, এ কথা সে একবারও ভাবিল না। ব্যথার যদি কেহ ব্যথী হয়, কষ্টতে যদি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, দুঃখের কথা যদি কেহ আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার ন্যায় বন্ধু এ জগতে আর নাই! ইহার পর সত্যেন্দ্র নলিনীকে প্রায়ই পূর্বের কথা জানাইত। কত নিশা দুইজনের সেই একই কথায় অবসান হইত। সত্যেন্দ্র যে কেবল বলিত, তাহা নহে, নলিনী আগ্রহের সহিত স্বামীর পূর্ব-ভালবাসার কথা শুনিতে ভালও বাসিত।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর পরে

দুই বৎসর গত হইয়াছে, নলিনীর বয়স এখন আঠার বৎসর, তাহার আর পূর্বের মত কষ্ট নাই। স্বামী এখন আর তাহাকে অযত্ন করেন না। স্বামীর ভালবাসা জোর করিয়া সে লইয়াছে। যে জোর করিয়া কিছু লইতে জানে, সে তাহা রাখিতেও জানে, তাহার এখন আর কোন কষ্টই নাই। সত্যেন্দ্রনাথ এখন পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্ত্রীর যত্নে, স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসায় তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কাছারির কর্মের অবকাশে সে এখন নলিনীর সহিত গল্প করে, উপহাস করে, গান-বাজনা করিয়া আমোদ পায়। এক কথায় সত্যেন্দ্র অনেকটা মানুষ হইয়াছে। মানুষ যেটা পায় না, সেইটাই তাহার অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্য-চরিত্রই এমনি। তুমি অশান্তিতে আছ, শান্তি খুঁজিয়া

বেড়াও—আমি শান্তিভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে যেন অশান্তিকে টানিয়া বাহির করি।

ছল ধরা যেন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ভাব। যে মাছটা পলাইয়া যায়, সেইটাই কি ছাই বড় হয়! সত্যেন্দ্রনাথও মানুষ। মানুষের স্বভাব কোথায় যাইবে? এত ভালবাসা, যত্ন ও শান্তির মধ্যে তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অশান্তি জাগিয়া উঠে। নিমিষের মধ্যে মনের মাঝে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মত যে বিপ্লব বাধিয়া যায়, তাহা সামলাইয়া লইতে নলিনীর অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, বুঝি আর সে সামলাইতে পারিবে না। এতদিনের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় সমস্তই বুঝি বিফল হইয়া যাইবে। নলিনীর এতটুকু ত্রুটি দেখিলে সত্যেন্দ্র ভাবে, সরলা থাকিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। হইত কি না ভগবান জানেন, হয়ত হইত না, হয়ত ইহা অপেক্ষা চতুর্গুন হইত! কিন্তু তাহাতে কি? সে মৎস্য যে পলাইয়া গিয়াছে! সত্যেন্দ্র এখনও সরলাকে ভুলিতে পারে নাই। কাছারি হইতে আসিয়া যদি নলিনীকে সে না দেখিতে পায়, অমনই মনে করে, কিসে আর কিসে!

নলিনী বড় বুদ্ধিমতী, সে সর্বদা স্বামীর নিকটে থাকে, কারণ সে জানিত, এখনও তিনি সরলাকে ভুলেন নাই। একেবারে ভুলিয়া যান, এ ইচ্ছা নলিনীর কখনও মনে হয় না; তবে অনর্থক মনে করিয়া কষ্ট না পান, এইজন্যই সে সর্বদা কাছে থাকিত, যত্ন করিত। নাই ভুলুন, কিন্তু তাহাকে ত অযত্ন করেন না—ইহাই নলিনীর ঢের।

গোপীকান্ত রায় পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। কলকাতায় তাঁহার বাটী নলিনীদের বাটীর কাছে।

কি একটা সম্বন্ধ থাকায় নলিনী তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকে। রায়-খুড়ীমা প্রায় প্রত্যহই সত্যেন্দ্রর বাটী বেড়াইতে আসেন। গোপীবাবুও প্রায় আসেন। গ্রাম-সম্পর্কে খুড়শ্বশুরকে সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় মান্য করে। সত্যেন্দ্রর বাসা তাঁহার বাটী হইতে দূরে হইলেও উভয় পরিবারে বেশ মেলামেশি হইয়া গিয়াছে।

নলিনীও মধ্যে মধ্যে কাকার বাড়ি বেড়াইতে যায়; কারণ, একে কাকার বাড়ি, তাহাতে গোপীবাবুর কন্যা হেমার সহিত তাহার বড় ভাব; বাল্যকালের সখী, কেহ কাহাকে

ছাড়িতে চাহে না। সেদিন তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কাছারি চলিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম নাই দেখিয়া নলিনী ছবি আঁকিতে বসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গড়গড় করিয়া একখানা গাড়ি ডেপুটিবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

কে আসিল? হেম বুঝি? আর ভাবিতে হইল না। বিষম কোলাহল করিতে করিতে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমা আসিয়া একেবারে নলিনীর চুল ধরিল, কহিল, আর লেখাপড়ার দরকার নেই, ওঠ, আমাদের বাড়ি চল, কাল দাদার বৌ এসেছে।

নলিনী কহিল, বৌ এসেছে, সঙ্গে আনলে না কেন?

হেম কহিল, তা কি হয়? নূতন এসেছে, হঠাৎ তোর এখানে আসবে কেন?

নলিনী কহিল, আমিই তবে যাবো কেন?

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, তোর ঘাড় যাবে, এই আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে, নলিনী কেন, অনেককেই যাইতে হইত! নলিনীকেও যাইতে হইল।

যাইতে নলিনীর বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ তাহাদের বাটী যাইলে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত। দুই-একদিন নলিনীর বাটী ফিরিবার পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথ কাছারি হইতে ফিরিয়াছিলেন। সেরূপ অবস্থায় সত্যেন্দ্রর বড় অসুবিধা হইত। তিনি কিছু মনে করুন আর নাই করুন, নলিনীর বড় লজ্জা করিত; কারণ সে জানিত, কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতের বাতাস না খাইলে স্বামীর গরম ছুটিত না। বিধাতার ইচ্ছা—বহু চেষ্টায় আজও নলিনী সাতটার পূর্বে ফিরিতে পারিল না। আসিয়া সে দেখিল, সত্যেন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, তখনও কিছু আহার করে নাই। খাওয়াইবার ভার নলিনী আপন হস্তেই রাখিয়াছিল। কাছে আসিলে সত্যেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে হাসি নলিনীর ভাল বোধ হইল না। সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। আসন পাতিয়া নলিনী জলখাবার খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সত্যেন্দ্র কিছু স্পর্শও করিল না। ক্ষুধা একেবারেই নাই। বহু সাধ্য-সাধনাতেও সে কিছু খাইল না। নলিনী বুঝিল এ অভিমান কেন।

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি?

আজ হেমাঙ্গিনী শ্বশুরবাড়ি যাইবে। তাহার স্বামী উপেন্দ্রবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। নলিনী বহু দিবস হেমার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। তাই আজ হেমা অনেক দুঃখ করিয়া তাহাকে যাইতে লিখিয়াছে।

নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি বিনা সে আর কোথাও যাইবে না; কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে প্রিয়-সখীর সহিত আর দেখা হয় না। নলিনী বড় বিপদে পড়িল। হেমা লিখিয়াছে, তাহারা তিনটার ট্রেনে রওনা হইবে। তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লওয়া কি করিয়া হয়? বহু কু-তর্কের পর নলিনী যাওয়াই স্থির করিল। যাইবার সময় দাসীকে সে বলিয়া দিল, যেন ঠিক তিনটার সময় রায়েদের বাড়িতে গাড়ি পাঠান হয়। গাড়ি পাঠানও হইয়াছিল, কিন্তু হেমার তিনটার ট্রেনে যাওয়া হইল না। সুতরাং সে নলিনীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না। অনেক জিদ করিয়াও সে হেমার হাত এড়াইতে পারিল না। হেমা আজ অনেক দিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। কতকাল আর দেখা হইবে না—সহজে কে ছাড়িয়া দেয়?

বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্বামী রাগ করিবেন, এ কথা বলিতে নলিনীর লজ্জা হইতেছিল—সহজে এ কথা কে বলিতে চাহে? এ হীনতা কে স্বীকার করে? বিশেষ এই বয়সে? অবশেষে সে কথাও সে বলিল, কিন্তু হেমা তাহা বিশ্বাস করিল না। সে হাসিয়া বলিল, বোকা বুঝিও না। রাগারাগির ব্যাপার আমি ঢের বুঝি। উপেনবাবুও অনেক রাগ করতে জানেন।

কথাটা হেমা হাসিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু নলিনী মর্মে পীড়া পাইল। সকলের স্বামী কি এক ছাঁচে গড়া? সকলেই কি উপেনবাবুর মত?

নলিনী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া সে শুনিল, বাবু বাহিরে শয়ন করিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী ওরফে মাতু, নলিনীর বাপের বাড়ির ঝি, সে নলিনীর সহিত আসিয়াছিল। অনেকদিনের লোক, বিশেষ সে নলিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, তাই সে নলিনীকে আজ বিলক্ষণ দশ কথা জানাইয়া দিল। বাটীর মধ্যে সে-ই কেবল জানিত, সত্যবাবু বিলক্ষণ রাগ করিয়াই বাহিরে শয্যা রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রে যখন শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, যখন সেই বহুদিনগত প্রফুল্ল-কমলসদৃশ সরলার মুখের সহিত নলিনীর মুখের ঈষৎ সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচনা করিতেছিল, যখন সরলার ভালবাসার নিকট নলিনীর ভালবাসা, সাগরের নিকট গোষ্পদের জল ধারণা করিবার জন্য মনের মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নলিনী সে গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, নলিনী। নলিনী আসিয়া সত্যেন্দ্রর পদতলে বসিল। সত্যেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল। বহুক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া পুরুষভাবে স্পষ্ট-স্বরে কহিল, তুমি এখানে কেন?

নলিনী কাঁদিতেছিল, কথা কহিতে পারিল না। কান্না দেখিয়া ডেপুটিবাবু আর একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, রাত হয়েচে, যাও, ভিতরে গিয়ে শোও গে।

নলিনী কাঁদিতেছিল; এবার চক্ষের জল মুছিয়া সে বলিল, তুমি শোবে চল।

সত্য ঘাড় নাড়িল, বলিল, আমার বড় ঘুম পেয়েচে, আর উঠতে পারব না।

কাঁদিলে সত্যেন্দ্র বিরক্ত হয়। নলিনী চক্ষের জল মুছিয়াছে; স্বামীর কাছে আর সে কাঁদিবে না। ধীরে ধীরে পায়ের উপর হাত রাখিয়া নলিনী বলিল, এবার আমাকে ক্ষমা কর। এখানে তোমার বড় কষ্ট হবে, ভিতরে চল।

সত্যেন্দ্র আর ভিতরে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে বলিল, কষ্টের কথা এত রাত্রে আর ভেবে কাজ নাই; তুমি শোও গে, আমিও ঘুমুই।

নলিনী সত্যেন্দ্রকে চিনিত। সমস্ত রাত্রি সে আপনার ঘরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। বলি, ও হেমাঙ্গিনী, একবার দেখিয়া গেলে না? রাগারাগির ব্যাপার তুমি বোঝ ভাল–

একবার মিটাইয়া দিবে নাকি? পরদিনও সত্যেন্দ্র বাটীর ভিতর আসিল না, বা নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

নলিনীর একখানা পত্র মাতু সত্যেন্দ্রর হাতে দিয়াছিল। সে সেখানা না পড়িয়াই মাতঙ্গিনীর সন্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এ-সব আর এনো না।

চারি-পাঁচদিন পরে একদিন নলিনীর বড় দাদা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাবনায় আসিয়া পৌছিলেন। হঠাৎ দাদাকে দেখিয়া নলিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হইল।

দাদা যে?

নরেন্দ্রবাবু নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস কেন বোন?

ব্যস্ত! কথাটার অর্থ নলিনী তখনই বুঝিয়া ফেলিল। হাসিয়া সে বলিল, তোমাদের যে অনেকদিন দেখিনি।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাঙ্গিয়াছে

যেদিন স্বামীর চরণে প্রণিপাত করিয়া নলিনী দাদার সহিত গাড়িতে উঠিল, সে রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথ একটুকুও ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, এতটা না করিলেও চলিতে পারিত। অনেকবার সত্যর মনের হইয়াছিল, এখনও সময় আছে, এ সময়ও গাড়ি ফিরাইয়া আনি। কিন্তু হায় রে অভিমান! তাহারই জন্য নলিনীকে ফিরাইয়া আনা হইল না।

যাইবার সময় মাতুও সঙ্গে গিয়াছিল। সে-ই কেবল যাইবার যথার্থ কারণ জানিত। নলিনী মাতুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, যেন সে বাটীতে কোন কথা না বলে।

নলিনী মনে করিল, এ কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অপযশ করা হইবে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহার স্বামীকে লোকে মন্দ বলিবার কে?

পিতৃ-গৃহে যাইয়া নলিনী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিল, ছোট ভাইটিকে কোলে লইল, শুধু সে হাসিতে পারিল না।

মা বলিলেন, নলিনী আমার একদিনের গাড়ির পরিশ্রমে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সে শুষ্ক মুখ আর প্রফুল্ল হইল না।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, একটা সামান্য কারণ হইতে গুরুতর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। শূর্পণখার ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্যই স্বর্ণ-লঙ্কা ধ্বংসের হেতু হইয়াছিল। অকিঞ্চিৎকর রূপলালসার জন্য শুধু ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়া গেল। মহানুভব রাজা হরিশচন্দ্র অতি সামান্য কারণেই অমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখানেও একটা সামান্য অভিমানে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রনাথের দোষ দেব কি?

নলিনী কখনো অভিমান করে নাই, স্বামীর কষ্টের কথা মনে করিয়া সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিত—আর পারিল না। সে ভাবিল, এই ক্ষুদ্র কারণে যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে মরে না কেন?

দারুণ অভিমানে নলিনী শুকাইতে লাগিল; ওদিকে সত্যেন্দ্রর অভিমান ফুরাইয়া গিয়াছে;

একদণ্ড না থাকিলে যাহার চলে না, তাহার এই মিছা অভিমান কতদিন থাকে? অভিমান দারুণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যেন্দ্র প্রত্যহ চাহিয়া থাকে—আজ হয়ত নলিনীর পত্র আসিবে, হয়ত সে লিখিবে, আমায় লইয়া যাও। সত্যেন্দ্র ভাবে, তাহা হইলে মাথায় করিয়া লইয়া আসিব, আর কখনও এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না। কিন্তু ভবিতব্য কে অতিক্রম করিবে? যাহা হইবার তাহা হইবেই। তুমি আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র, আজ কাল করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, হতভাগিনী কোন কথা লিখিল না।

পাপিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ ভাঙ্গিল, কিন্তু মচকাইল না। ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশ সত্যেন্দ্রনাথের অসহ্য হইল। লুপ্ত অভিমান আবার দৃপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধ আসিয়া

তাহাতে যোগ দিল। হিতাহিত জ্ঞান-রহিত সত্যেন্দ্রনাথ নিজের দোষ দেখিল না, ভাবিল, যাহার অহঙ্কার এত, তাহার প্রতিশোধও তদ্রূপ প্রয়োজন।

কেহই নিজের দোষ দেখিল না। সেই অর্ধমিলিত হৃদয় দুইটি আবার চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া চলিল। যৌবনের প্রারম্ভে সঙ্কুচিতা লতাকে কে টানিয়া বাড়াইয়াছিল, কিন্তু আর সহে না, এবার ছিঁড়িবার উপক্রম হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ দিই না, তাহারও দিই না। দুইজনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মগ্লানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাও বুঝিতে পারিতাম না, তোমরাও পারিতে না। বুঝিতে পারি না—কি আকাঙ্খায়, কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে!

সাধ মিটে না; মিটাইবার ইচ্ছাও নাই। কি সাধ তাহাও হয়ত ভাল বুঝিতে পারি না। তথাপি কাতর-হৃদয় কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খায় সকল সময়ই হাহা করিয়া উঠে। কি যে হয়, কেন যে অদৃশ্য গতি ঐ লক্ষ্যহীন প্রান্তে পরিচালিত হয়, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না।

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। ইচ্ছা হইলেও মনের সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিয়াও তোমাকে অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিব। দিব কি?

.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যা

অমন রূপে-গুণে বৌ, পুত্রের পছন্দ হয় না! গৃহিনীর বড় দুঃখ। অমন চাঁদপানা বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিলেন না ভাবিয়া গৃহিনী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া আছেন। জননীর শত চেষ্টাতেও পুত্রের মত ফিরিল না। এখন আর উপায় কি? ছেলেরই যদি পছন্দ হইল না, তখন কিসের বৌ? ছেলের আদরেই ত বৌয়ের আদর! আর আমারই বা হাত কি? নিজে

দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিলে আমি কি আটকাইতে পারি? ইত্যাদি মৃদু বচন আওড়াইতে আওড়াইতে অভ্যাসানুসারে গৃহিণী বরণডালা সাজাইতে বসিলেন।

দুই বৎসর পুর্বে হরদেববাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্মরণ হইল—চক্ষে জল আসিল, আবার নলিনীর কথা মনে পড়িল—জলবেগ আরও বর্ধিত হইল। কি জানি, কেমন বৌ আসিবে? কর্তা বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় পোড়াকপালীর এ দুরবস্থা দেখিতে হইত না।

সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়া আসিল। মা বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আবার পোড়া চোখে জল আসিল। জল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, চোখে কি পড়েচে, কেবল জল আসছে। গিরিবালা বড় মুখফোঁড় মেয়ে—বিশেষ নলিনীর সহিত তাহার বেহান পাতানো ছিল, সে বলিয়া ফেলিল, এই বয়সে তিনবার, আরও কতবার চোখে কি পড়বে কে জানে!

কথাটা গৃহিণী শুনিলেন, সত্যরও কানে গেল। কাল সাধের ফুলশয্যা।

কোথা হইতে একটা ভারি জমকালো রকম তত্ত্ব আসিয়াছে। বর-কনের ঢাকাই শাড়ি, ধুতি, চাদর ইত্যাদি বড় সুন্দর রকমের। কনের বারাণসী চেলীখানির মত সুন্দর চেলী গ্রামে ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথাকার তত্ত্ব? এক-একবার ঢোক গিলিয়া বলিতেছেন, সত্যর কে একজন বন্ধু পাঠিয়েচে।

গৃহিণী চক্ষের জল চাপিয়া, যথার্থ সংবাদ চাপিয়া হাসিকান্না-মিশ্রিত মুখে তত্ত্বের মিষ্টান্নাদি বণ্টন করিলেন।

সকলে যে যাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাজবালা বলিল, বেশ তত্ত্ব করেচে। নৃত্যকালী বলিল, তা আর হবে না? বড়লোক তত্ত্ব পাঠালে এমনই পাঠায়। ক্রমশঃ এ কথা চাপা পড়িল। তখন যোগমায়া বলিল, আচ্ছা, আবার বিয়ে করলে কেন? জ্ঞানদা কহিল, কি জানি বোন, অমন রূপে-গুণে বৌ! কে জানে ও-সব বোঝা যায় না।

রামমণি জাতিতে নাপিতের কন্যা; তবে অবস্থা ভাল, দেখিতেও মন্দ নহে, এই নাকটি সামান্য চাপা মাত্র। কোন কোন পরশ্রীকাতর লোক তাহার চক্ষেরও দোষ দিত, বলিত, হাতির চোখের চেয়েও ছোট।

যাক, এ নিন্দাবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। রামমণি একটু হাসিয়া বলিল, তোমাদের ঘটে যদি বুদ্ধি থাকত তা হলে কি আর ও-কথা বল? ছুঁড়ি সদাসর্বদা যে ফিকফিক করে হেসে কথা বলত, তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, স্বভাব-চরিত্র মন্দ লো, স্বভাব-চরিত্র মন্দ। না হলে চাকরি স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়? আবার বে করে? মুখে কিছু না বলিলেও কথাটা অনেকের মতের সহিত মিলিল।

ইহার দুই-একদিন পরে, গ্রামের প্রায় সকলেই জানিল যে, রামমণি জমিদারের বাটীর গূঢ়রহস্য ভেদ করিয়াছে। নাপিতের মেয়ে না হইলে এত বুদ্ধি কি বামন-কায়েতের মেয়ের হয়? কথাটা অনেকেই স্বীকার করিল।

এবার গৃহিণীর পালা। এ কথা যখন তাঁহার কানে গেল, তিনি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন। আমার নলিনী কুলটা! কি জানি কেন গৃহিণী সরলা অপেক্ষা নলিনীকে অধিক ভালবাসিয়াছিলেন। জন্মের মত সেই নলিনীর কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন, সত্য হয় ভালই—না হয় আমি নলিনীকে লইয়া কাশীবাসী হইব। পোড়াকপালীর এ-জন্মের মত সব সাধই ত মিটিয়াছে।

তখন তিনি দ্বার খুলিয়া মাতুকে ডাকিয়া আনিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিলেন। মাতুই তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল।

দুইজনের চক্ষুজলের বহু বিনিময় হইল। কেমন করিয়া নলিনীর সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, কি অপরাধে সত্যেন্দ্র তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে, কত কাতরবচনে সে ঠাকুরানীকে প্রণাম জানাইয়াছে, ইত্যাদি বিবরণ মাতঙ্গিনী বেশ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণীকে শুনাইল। শুনিতে শুনিতে গৃহিণীর পূর্ব-স্নেহ শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল, পুত্রের উপর দারুণ অভিমান জন্মিল। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, আমি কি সত্যর কেউ নহি? সকল কথাই কি আমার উপেক্ষার যোগ্য? আমার কি একটা কথাও থাকিবে না? আমি আবার নলিনীকে গৃহে আনিব। অমন লক্ষ্মীর কি এ দশা করিতে আছে?

সেইদিন সন্ধ্যার সময় জননী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, নলিনীকে নিয়ে এসো।

পুত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, ওরে আমার নলিনীর নামে গ্রামময় কলঙ্ক রটচে যে, তুই তার স্বামী—তার

মান রাখবি নি?

কিসের কলঙ্ক?

অমন করে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলে আমি কার মুখ বন্ধ করব?

মুখ বন্ধ করে কি হবে?

তবু আনবি নি?

না।

জননী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন, কিরূপ ক্রুদ্ধা হইতে হইবে এবং তখন কি কথা বলিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু ভাবিতে হইল না, বলিলেন, তবে কালই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে একদণ্ডও আর থাকতে চাই না।

সত্য আর সে সত্য নাই। সরলার আদরের ধন, ক্রীড়ার দ্রব্য, শখের জিনিস—অন্যমনস্ক, উচ্চমনা, সরল-হৃদয় প্রফুল্লবদন স্বামী, নলিনীর বহু যত্নের বহু ক্লেশের, মনের মত সত্যেন্দ্রনাথ আর নাই। সেও বুকে পাষাণ চাপাইয়াছে, লজ্জা-শরম হিতাহিত জ্ঞান সকলই হারাইয়াছে—সে অনায়াসে বলিল, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাও। আমি আর কা'কেও আনতে পারবো না।

সত্যর মুখে এ কথা শুনিবেন, মা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একবার বলিলেন, বৌ আমার কুলটা নয়, তা বেশ জেনো। গ্রামের লোকে যা ইচ্ছা হয় বলে, কিন্তু আমি কখনও তা বিশ্বাস করব না।

পরদিন পিসিমা সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার এক বন্ধু তোমাকে তত্ত্ব করেচে, দেখেচ কি?

সত্য ঘাড় নাড়িল। বলিল, না, কে বন্ধু?

জানি না। ব'সো, কাপড়গুলো নিয়ে আসি।

অল্পক্ষণ পরে পিসিমা একতাড়া কাপড় লইয়া আসিলেন। সত্য দেখিল, বেশ মূল্যবান বস্ত্র। সে বিস্মিত হইল। কোন্ বন্ধু পাঠাইয়াছে? চেলীখানি বেশ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে লক্ষ্য করিল, এক কোণে কি একটা বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিল, একখানা ক্ষুদ্র পত্র।

হস্তাক্ষর দেখিয়া সত্যেন্দ্রর মাথা ঝাঁৎ করিয়া উঠিল। লেখা আছে–

ভগিনী, স্নেহের উপহার প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। তোমার দিদি যাহা পাঠাইল, গ্রহণ করিও।

সে রাতের ফুলশয্যা সত্যেন্দ্রর পক্ষে কন্টকশয্যা হইল।

.

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথের পত্র

যুবার অভিমান কোন বালকে দেখিয়াছ কি? সত্যেন্দ্রর ন্যায় অভিমান করিয়া এতটা অনর্থপাত করিতে কোন বালককে দেখিয়াছ কি? ছেলেবেলায় পুস্তক লইয়া খেলা করিতাম বলিয়া পিতার নিকট শাস্তি ভোগ করিয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ; শাস্তি পাইবে, ভয় হয় কি?

তোমরা যুবা; সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই–যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভার বোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্লান্তভাবে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভুতি প্রকাশ করিও না। ঘৃণা কর, কিছু বলিবে না; দয়া করিও না, মরিয়া যাইবে।

পাপী যদি মরিয়া যায়, প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবে কে? সত্যেন্দ্র শ্রান্ত জীবনের প্রত্যেক দিন এক-একটা দুঃসহ বোঝা লইয়া আসে। সমস্ত দিন ছটফট করিয়া যেন সে বোঝা আর নামাইতে পারে না।

সত্যেন্দ্রর মাঝে মাঝে বোধ হয়, যেন তাহার অতীত জীবন সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; শুধু কিছুতেই ভুলিতে পারে না তাহার সাধের নলিনী পাবনায় চরিত্রহীনা হইয়াছিল, তাই সে তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রায় দুইমাস গত হইল, সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে। আজ একখানা পত্র ও একটি ছোট পার্শেল আসিয়া সত্যেন্দ্রর নিকট পৌছিল।

পত্রটি নলিনীর দাদা নরেন্দ্রবাবুর, সেখানি এই–

সত্যেন্দ্রবাবু,

অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, সে কেবল আমার প্রাণাধিকা ভগিনী নলিনীর জন্য। মৃত্যুর পূর্বে সে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে, যেন এই অঙ্গুরীয়টি আপনার নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়। আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি পাঠাইলাম। ভগিনীর ইচ্ছা ছিল এইটি আপনার নূতন স্ত্রীকে পরাইয়া দেন, ভরসা করি তাহার আশা পুরিবে। আর মৃত্যুর পূর্বে সে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়া গিয়াছে, যেন তাহার ছোট ভগিনীটি ক্লেশ না পায়।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ

নলিনীর যখন একটি ছোট পুত্র-সন্তান হইয়া মরিয়া যায়, সত্যেন্দ্রনাথ এই অঙ্গুরীয়টি তাহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিল; সে-কথা মনে পড়িয়াছিল কি?

সত্যেন্দ্রনাথ আর পাবনায় যান নাই। যে কারণেই হোক মাতাঠাকুরানী আর কাশীবাসী হইতে পারিলেন না। নূতন বধূর নাম ছিল বিধু। বিধু বোধ হয় পূর্বজন্মে নলিনীর ভগিনী ছিল।